প্রচ্ছদ কাহিনী

অমর্ত্য সেন

অতিথি সম্পাদকের কথা ....

পড়শীর পক্ষ থেকে যখন অমর্ত্য সেনের ওপর কভার স্টোরি করার দায়িত্ব দেওয়া হল, তখন যুগপৎ গর্বিত ও চিন্তিত হলাম। গবেষণামূলক কাজের সূত্রে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় কয়েকজন নোবেল বিজয়ীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সাথে আমার নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক 'কমন গ্রাউন্ড' ছিল। কিন্তু এই মানুষটি কেবল মাত্র একজন অসাধারণ ইকনমিস্ট নন, শুধুমাত্র ইকনমিক্সে প্রথম এশিয়ান নোবেল বিজয়ীই নন, তাঁর চিন্তা ও কর্মকান্ড ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে। অনেকদিন ধরেই তিনি অভিহিত হচ্ছেন 'The conscience of economics' হিসেবে। তাঁর কাজ ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ থাকে না। তাঁর লেখা বই অনুদিত হয়েছে তিরিশটিরও বেশি ভাষায়। অমর্ত্য সেন একজন বিশ্ব নাগরিক - প্রকৃত অর্থেই।

একটা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার, দু'জন বাঙালী নোবেল বিজয়ীই - রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য সেন - শান্তিনিকেতনের সাথে যুক্ত। অমর্ত্য সেনের ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর ইন্টারভিউতে তিনি এ বিষয়ে বিশদভাবে বলেছেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময় বুঝতে পারলাম জীবনের এতগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েও বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ আজও বজায় আছে। সেটা যে কতোখানি বেশীমাত্রায় তা বোঝা যায় তাঁর কঠিন বাংলা শব্দের সঠিক ও অনায়াস ব্যবহার এবং বানানের শুদ্ধতার প্রতি মনোযোগ থেকে। যে সব মানুষজন বিদেশে এসেই প্রাণপণে মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিদেশে বসবাসের দোহাই দিয়ে, তাঁরা এ বিষয়ে প্রফেসর সেনের উদাহরণটি একটু ভেবে দেখতে পারেন।

অমর্ত্য সেনের ওপর পড়শীর এই সংখ্যাটিতে আমরা অনেকের থেকেই সাহায্য পেয়েছি। সবার আগে নিশ্চয় আসবে স্বয়ং অমর্ত্য সেনের কথা। তিনি ইন্টারভিউতে আমাদের জানালেন তাঁর ছোটবেলার কথা, তাঁর গড়ে ওঠার কথা। তাঁর চ্যারিটি ট্রাস্ট প্রতীচী নিয়েও কিছু কথা হল। বিশ্বায়ন ও দারিদ্র নিয়েও তাঁর মতামত জানালেন তিনি। অমর্ত্য সেনের পরেই আসবে ইকনমিক্স জগতের আরেক দিক্‌পাল প্রণব বর্ধনের কথা। বার্কলির প্রফেসর প্রণব বর্ধন তার অসম্ভব ব্যস্ত তার মধ্যেও আমাদের একটি সুন্দর ও বেশ বড় ইন্টারভিউ দিলেন। তাঁর চোখে আমরা অনেক গভীরভাবে দেখতে পেলাম অমর্ত্য সেনের বহুমাত্রিক চিন্তাধারাকে। এরপর Utah-র প্রফেসর বাসুদেব বিশ্বাস আলোচনা করেছেন অমর্ত্য সেনের কয়েকটি কাজ নিয়ে। তিনি অমর্ত্য সেনের অসাধারণ প্রতিভাবান সহপাঠী বিগত সুখময় চক্রবর্তীর কথাও বলেছেন। সুলেখক শ্যামল চৌধুরী লিখেছেন অমর্ত্য সেনের সমাজ ভাবনা নিয়ে। একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী আমরা পেয়েছি নবনীতা সেনের কাছ থেকে। সুমন ঘোষ Florida -তে ইকনমিক্সের প্রফেসর। তিনি ফিল্ম নির্দেশকও। সুমন লিখেছেন তিনি কেমন দেখেছেন অমর্ত্য সেনকে। প্রসঙ্গত উলে-খ্য, সুমন অমর্ত্য সেনের ওপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তুলেছেন। সবশেষে বলি, MIT-র কর্ণ বসুর কথা। এই সংখ্যায় ব্যবহৃত অমর্ত্য সেনের একক ছবিটি তাঁরই অবদান। অমর্ত্য সেনের কাজ ও চিন্তাধারার বিশাল ব্যাপ্তি স্বাভাবিকভাবেই একটি মাত্র সংখ্যায় প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়। আমাদের এই প্রচেষ্টাটি পাঠকদের ভাল লাগবে, এই আশা নিয়েই শেষ করছি। ❒

অরুণ দাস

এল ডোরাডো হিল্‌স, ক্যালিফোর্নিয়া

অমর্ত্য বললেন কিছু কথা পড়শীকে

অরুণ দাস

অমর্ত্য সেন বর্তমান বিশ্বে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। 'Welfare Economics'-এ তাঁর অবদানের কথা আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে। বলা হয় তাঁকে - "The conscience of economics'। আজ ৭২ বছর বয়সেও তাঁর কর্মক্ষমতায় ভাঁটা পড়েনি একটুও। সম্প্রতি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন - সেখানে ব্যস্ত ছিলেন বিস্তৃত কর্মকান্ডে। ভারত থেকে ফিরেই তাঁর ঝটিকা সফর ক্যালিফোর্নিয়ায়। ক্যালিফোর্নিয়াতে তাঁর দিন তিনেকের সফরে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা, অনেকগুলি রেডিও প্রোগ্রাম, ইন্টারভিউ,

কমনওয়েলথ ক্লাবে বক্তৃতা - প্রায় ১৫টি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। তারই মধ্যে পড়শীকে দিলেন একটি অসাধারণ ইন্টারভিউ। তাঁর সাথে কথা বললেন পড়শীর **অরুণ দাস** এবং অমূল্য মুহূর্তগুলিকে ক্যামেরায় তুলে রাখলেন **নবনীতা সেন**।

পড়শী ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ - দুই বাংলার প্রতিই আপনার অনেক টান। এই প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

অমর্ত্য সেন ঃ এটা এমন একটা বড় বিষয়, কিছু বলতে গেলেই বেশী বিস্তারিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা (হাসতে হাসতে)।

পড়শী ঃ একটু ছোট করে যদি বলেন (হাসতে হাসতে)।

অমর্ত্য ঃ আমার আদি বাসা ঢাকায়। মানিকগঞ্জের মত্ত গ্রামে। কিন্তু প্রধানতঃ ঢাকা শহরে বড় হয়েছি, পুরোনো ঢাকার ওয়াড়িতে। যদিও আমার জন্ম হয়েছে শান্তিনিকেতনে। আমার মায়ের পরিবারও ঢাকারই লোক, বিক্রমপুরের, কিন্তু তাঁরা থাকতেন শান্তিনিকেতনে। আমার মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে পড়াতেন। সেই জন্য আমার শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ ছিল। আমার পিতামহ ঢাকাতে আইনচর্চা করতেন এবং আমার বাবা আশুতোষ সেন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরীতে পড়ার পরে শান্তি নিকেতনে স্কুলে ভর্তি হলাম। এছাড়া আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু সব কিছু তো একসঙ্গে বলা যাবে না, তাই এটাকেই উত্তর বলে ধরতে হবে।

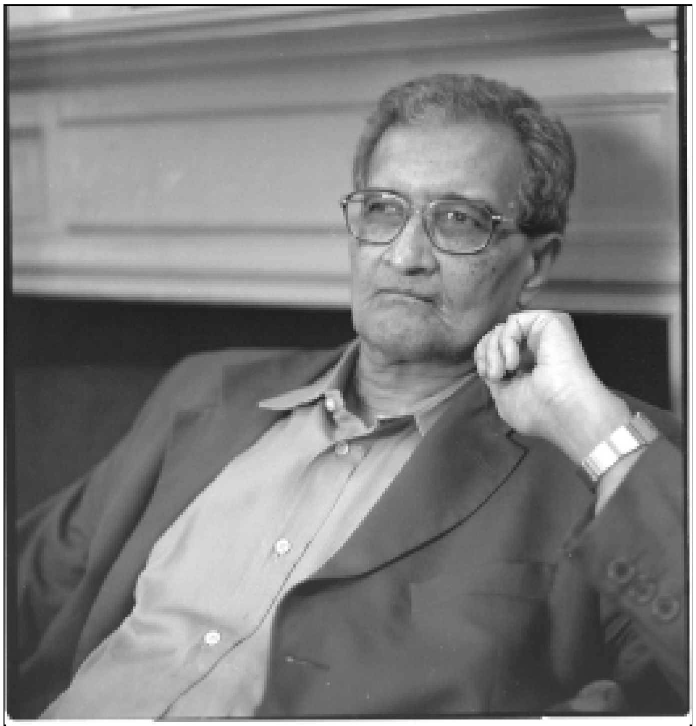
অমর্ত্য সেন (ছবি : কর্ণ বসু)

পড়শী ঃ আপনার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলুন।

অমর্ত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা, কবিতা, গদ্য সবকিছুই শোনার সুযোগ ছেলেবেলা থেকে যথেষ্ট হওয়াতে তার প্রভাব না হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে পড়াশুনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে সারাক্ষণই আলোচনা হত। আমার চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়ে সুন্দর আলোচনা আছে আতিউর রহমানের একটি বইয়ে - তার নাম 'রবীন্দ্র-অমর্ত্য ভাবনা' (প্রকাশক - ইউনিভার্সিটি প্রেস)। বিশেষতঃ নিজের আত্মপরিচয় যে শুধু একটা সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, তাতে বাকী পৃথিবীর সঙ্গে যোগ থাকারও প্রয়োজন আছে। এই জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমার মাথায় ঢুকেছে। একবার ঢোকার পরে এগুলো মাথা থেকে বের করা সহজ নয় এবং এখনো বের হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমার ইদানীং দু'টো বই বেরিয়েছে - একটা The Argumentative Indian, আরেকটা Identity and Violence – এই দু'টোর মধ্যেই নিজের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বপরিচয়ের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা আছে।

পড়শী ঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সেই সময়ের আর কার প্রভাব আপনার চিন্তাভাবনার উপরে পড়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

অমর্ত্য ঃ অনেকেরই পড়েছে।

পড়শী ঃ বিশেষভাবে?

অমর্ত্য ঃ বিশেষভাবে অবিভক্ত বাংলায় বড় হওয়ার ফলে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ছিল ছেলে বয়স থেকেই। সেজন্য একদিকে যেমন কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ - এঁদের সবারই কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা ভাষার অন্য ধরণের লেখার প্রভাব যথেষ্ট আছে বলেই আমি মনে করি। সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু এঁদের হাস্যময়ী কিন্তু গভীর চিন্তার ভক্ত আমি ছেলে বয়স থেকেই। কিন্তু কোনটা কতটা প্রভাব করেছে আলাদা করে বলা কঠিন। বাইরের সাহিত্যের মধ্যে আমার ছোট বয়সে সবচেয়ে বেশী বোধহয় ভাল লাগত জর্জ বার্নার্ড শ'র লেখা। আমার ধারণা যে জর্জ বার্নার্ড শ'র কোনো নাটক নেই যেটা আমি ছেলে বয়েসে একাধিকবার পড়িনি। রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে তা যুক্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে লেখার ভঙ্গী এবং বড় জিনিসকে ছোট আকারে আয়ত্বের মধ্যে আনার প্রচেষ্টাটিও ভাল লাগত। নাম করতে গেলে আরো প্রায় দুশোজনের নাম করতে পারি (হাসতে হাসতে) যাদের লেখা আমি বার বার পড়েছি; তার মধ্যে শেক্সপীয়ার নিশ্চয়ই একজন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পড়শী ঃ আপনার চ্যারিটি ফাউন্ডেশন প্রতীচী - ভারত ও বাংলাদেশ - দুই দেশেই কাজ করছে। এখন তারা কি কি কাজ করছেন এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা কি ধরণের? এই কাজে প্রতীচীকে কারা সাহায্য করছেন?

অমর্ত্য ঃ নোবেল প্রাইজের অর্থেই চ্যারিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজের ব্যাপারে খুবই সাহায্য পাই আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। প্রতীচী বাংলাদেশ ট্রাস্টের সভাপতি হচ্ছেন রেহমান সোবহান। বাংলাদেশের কমিটি খুবই আন্তরিকভাবে এই কাজগুলো করে চলার চেষ্টা করছেন। তাতে খুশী ও গর্বিত হবার কারণ আছে। প্রতীচী বাংলাদেশ ট্রাস্ট প্রধানতঃ নারী পুরুষের বৈষম্য নিয়ে কাজ করছে। যেমন গ্রামবাসী

অল্পবয়সী মেয়েদের স্কলারশিপ দিয়ে সাংবাদিকতা শেখানো। একাজে খুবই সাহায্য করেন BRAC-এর ফজলে হাসান আবেদ। তাছাড়া বাংলাদেশের একটি প্রধান কাগজ 'প্রথম আলোর' সম্পাদক মতিউর রহমানও। অল্পবয়সী মেয়েদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা, লেখা দেখা, উপদেশ দেওয়া, কাগজে ছাপানো সব ব্যাপারেই মতিউর ভাই খুবই সাহায্য করছেন।

এই স্কলারশিপগুলি দেওয়া হয় আমার বিগত বন্ধু (এবং রেহমান সোবহানের স্ত্রী) সালমা সোবহানের নামে। সেই স্কলারশিপগুলোর সাহায্যেই তরুণীরা গ্রামাঞ্চলে যান ও সেখান থেকে লেখার চেষ্টা করেন। তাঁরা অনেক সময়ে সুন্দর লেখাও লেখেন এবং 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান সেগুলো দেখেন। অনেক সময় লেখাতে কি কি ঘাটতি হ'ল সে বিষয়েও ওঁদের শেখান।

প্রতীচী ইন্ডিয়া ট্রাস্ট প্রধানতঃ কাজ করছে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে। আমরা দেখবার চেষ্টা করছি যে কি কি কারণে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিতরণ ব্যবস্থাতে এত ঘাটতি আছে। সেই নিয়ে আমাদের কয়েকটি রিপোর্ট বেরিয়েছে। তাছাড়া অন্যত্রও আমাদের নানারকম কাজকর্ম হয়েছে। যেমন প্রতীচী স্কুল হয়েছে উড়িষ্যাতে, এবং সেই সঙ্গে উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে যেখানে ঝড় বৃষ্টিতে বসবাসের খুবই ক্ষতি হয়েছিল সেখানে কিভাবে পুনর্নির্মান করতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু কাজকর্ম চলছে।

ইন্টারভিউ-এর পর অমর্ত্য সেনের (মাঝখানে) সাথে অরুণ দাস, নবনীতা সেন ও অন্যান্য

আমাদের ভবিষ্যত কাজের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতীচী বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও প্রতীচী ইন্ডিয়া ট্রাস্ট্র - দুটি ট্রাস্ট্রের ব্যাপারেই কিছু কিছু ভাবা হয়েছে। প্রতীচী ইন্ডিয়া ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমরা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ভারতীয় স্বাস্থ্য বিতরণের ব্যবস্থা নিয়ে যে সমালোচনা করেছি, সে সমালোচনা নানা জায়গাতেই আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু পরিবর্তনও এর ফলে এসে থাকতে পারে। এটা আমাদের ধারণা, অন্ততঃ তাঁরা তাই বলছেন। কিন্তু তার সঙ্গে ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকল্পনাও নতুন ভাবে প্রসারিত হোক এই চেষ্টা চলছে। ইদানীং প-্যানিং কমিশনের প্রধান কর্তা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া কলকাতায় এসেছিলেন এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। এবং সে আলোচনা থেকে কিছু ফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের খুবই বিশ্বাস। তাছাড়া আমরা দেখছি শিক্ষকদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে করণীয় কি কি আছে। আমাদের যুক্তভাবে কি করা যায়, সে নিয়ে আলোচনা চলছে। আমাদের আশা, আগামী জুনের শেষে অথবা জুলাইয়ের গোড়াতে এ নিয়ে প্রতীচী ট্রাস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রধান ইউনিয়নের (ABPTA) যুক্ত সভা হবে কলকাতাতে। সেখানে কিভাবে এগোলে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব ভালোভাবে নির্ধারণ করা যাবে এ নিয়ে আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের নিজেদের যা যা সমস্যা আছে সেইসব সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করতে হবে সে নিয়েও আলোচনা হবে। আমাদের ট্রাস্টের একটা প্রধান প্রচেষ্টা হচ্ছে যে যে কটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন সরকার, NGO, ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্র সবাই একসঙ্গে বদ্ধপরিকর হয়ে শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় উন্নতির চেষ্টা করা। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হবে।

তাছাড়া আমরা গত চার বছর ধরে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের একটা বাৎসরিক মিটিং করি। সাধারণতঃ জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে মিটিং হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জায়গা থেকেই অনেক অভিভাবক আসেন এবং শিক্ষকও আসেন। সেখানে আমাদের আলোচনা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভালভাবে পরিচালনা করার উন্নতির উপায় নিয়ে।

প্রতীচী বাংলাদেশ ট্রাস্টে ভবিষ্যতে নারী পুরুষের বৈষম্য কমানোর দিকে কি কি করা যেতে পারে সে নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রতীচী বাংলাদেশ সম্পর্কে সবচেয়ে পরিস্কারভাবে বলতে পারবেন রেহমান সোবহান।

পড়শী ঃ বিশ্বায়ন নিয়ে আপনার মত কি? ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল গরীব শ্রেণীর কতটা উন্নতি হবে এতে?

অমর্ত্য ঃ আমার ধারণা যে, বিশ্বায়ন বিষয়ে যে উষ্মা প্রকাশ করা হয়, তার অনেকটাই বোধহয় বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত না, অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত। পৃথিবীর সব অঞ্চলের সভ্যতার প্রকাশেই বাকী বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অবদান আছে। এটা আমাদের দেখতে হবে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতার বৈষম্যের ফলে লোকের জীবনযাত্রার মধ্যে যে বৈষম্য আছে সেগুলোকে কিভাবে কমানো যেতে পারে। সে কমানোর প্রচেষ্টাতে বিশ্বায়ন বন্ধ করা একটা খুব শুভ পথ বলে মনে করি না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন বা institutional reform খুবই দরকার। পৃথিবীতে যখন এখনকার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলো (United Nation, IMF, World Bank) পাকা করা হল - ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে, সেসময়ে অর্ধেক পৃথিবীই ছিল ব্রিটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অংশ। কোনো গণতান্ত্রিক গরীব দেশ পৃথিবীতে তখন ছিল না। এখন যে পরিবর্তন এসেছে, তার ফলে এ

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন....... অমর্ত্য বললেন

অধ্যাপক প্রণব বর্ধনের চোখে

অমর্ত্য সেন

অরুণ দাস

প্রণব বর্ধন। ইকনমিক্স জগতে একটি বিশ্ববিখ্যাত নাম। ১৯৬৬ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির Ph.D.। বিভিন্ন নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে - MIT, Stanford University, London School of Economics, Trinity College এবং আরও বেশ কয়েকটি। ১৯৭৭ সাল থেকে University of California, Berkeley -তে Economics -এর প্রফেসর। অমর্ত্য সেনের সাথে তাঁর অনেকদিনের পরিচিতি। তাঁর অজস্র ব্যস্ততার মধ্যেও পড়শীকে দিলেন অনেকটা সময়। বললেন অনেক কথা - অমর্ত্য সেনের জীবন নিয়ে, কাজ নিয়ে, তাঁদের দু'জনের কিছু কাজের মিল নিয়ে। পড়শীর পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন **অরুণ দাস** আর সাক্ষাৎকারটিকে ক্যামেরায় ধরে রাখলেন **নবনীতা সেন**।

পড়শী ঃ প্রফেসর অমর্ত্য সেনকে কি আপনি অনেক ছোটবেলা থেকে চেনেন?

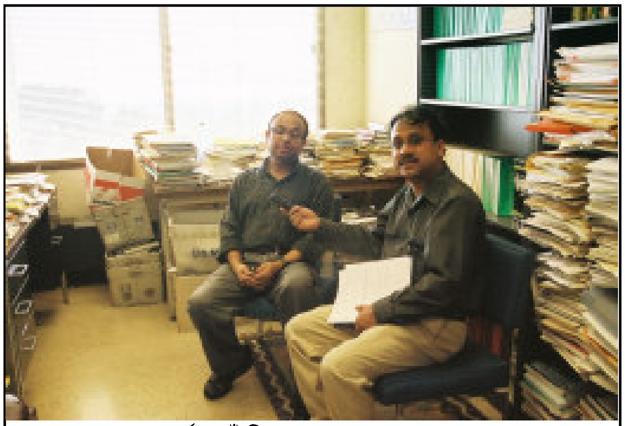

প্রণব বর্ধন (বাঁদিকে)-এর সাথে অরুণ দাস

প্রণব বর্ধন ঃ শান্তিনিকেতনে খুব ছোটবেলায় কিন্তু আমার অমর্ত্যদার সঙ্গে আলাপ ছিল না। ওখানে আমার বাবা-মা থাকতেন, তার আগে আমার মামা থাকতেন, ওঁরা অমর্ত্যদার পরিবারকে অল্পস্বল্প চেনেন। ১৯৬৩ সালে, কেমব্রিজে পড়তে গিয়ে অমর্ত্যদার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, তারপর থেকেই উনি খুবই ঘনিষ্ট।

পড়শী ঃ আপনাদের ছোটবেলার শান্তিনিকেতনের পরিবেশ আপনাদের পরবর্তী জীবনকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে?

প্রণব ঃ অমর্ত্যদাকে অনেক বেশি করেছে, কারণ উনি ওখানে ছোটবেলায় পড়েছেন। আমি ওখানে স্কুলে পড়িনি। আমি শৈশবের একটা বড় অংশ শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছি। আমার বাবা স্কুলে যাওয়াতে বিশ্বাস করতেন না, উনি নিজেই পড়াতেন আমাকে। আমি শান্তি নিকেতনের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলতাম, কিন্তু স্কুলের ক্লাসে যাইনি। বাবা কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে সপ্তাহে একবার আসতেন, আমাকে হোমটাস্ক দিয়ে যেতেন, আর আমি হোমটাস্কগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ঐ প্রত্যেক ক্লাসের যেই খেলার ঘন্টা বাজত ......

পড়শী ঃ স্কুলটা কাছেই ছিল?

প্রণব ঃ পাশেই থাকতাম। যেই ক্লাসের ঘন্টা বাজল খেলার, ক্লাস সেভেনের ধরা যাক - আমি ওদের সঙ্গে খেললাম, একঘন্টা বাদে ঘন্টা বাজল, ওরা ঢুকে গেল, ক্লাস এইটের তখন খেলার সময়, আমি তখন ওদের সঙ্গে খেললাম - সারাদিন ওদের সঙ্গে খেলেই গেছি, কখনো পড়িনি ওদের সাথে।

পড়শী ঃ মানে পুরো স্কুলটাই আপনি....

প্রণব ঃ শেষদিকে আমি কলকাতার হিন্দু স্কুলে পড়ি।

পড়শী ঃ রবীন্দ্রনাথকে আপনি দেখেছেন কি?

প্রণব ঃ আমি দেখিনি, অমর্ত্যদা দেখেছেন। ওঁর বাড়ির সঙ্গে তো রবীন্দ্রনাথের অনেক যোগাযোগ ছিল। ওঁর দাদু ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথের কাছের লোক, তাঁকে দেখেছি। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের যে অনুষ্ঠানগুলো হত, আমি যখন ছোটো ছিলাম দেখতাম যে উনি পৌরহিত্য করতেন।

পড়শী ঃ অমর্ত্য সেনের পরিবারের সঙ্গে আলাপ ছিল?

প্রণব ঃ ওঁর মাকে আমি চিনতাম। ওঁর পরিবারের কিছু আত্মীয়ার সাথে আমার মার আলাপ ছিল। যখন কেমব্রিজে গেলাম তখন থেকেই অমর্ত্যদার সঙ্গে আলাপ। তারপর থেকেই উনি আমার কাজে খুব উৎসাহ দেখালেন, আমিও ওঁর কাজে। কাজ নিয়ে বিশেষ করে অর্থনীতিতে আর্থিক উন্নয়নের বিষয়ে, তাছাড়া অন্যান্য জিনিসেও উৎসাহ ছিল।

পড়শী ঃ এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব detail-এ, অমর্ত্য সেন যে কলেজে পড়েছিলেন, আপনিও কি সেখানেই পড়েছিলেন?

প্রণব ঃ হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সীতে, কিন্তু আমি যখন প্রেসিডেন্সীতে গেছি, উনি চলে গেছেন, কিন্তু ওঁর খ্যাতিটা রয়ে গেছে। এবং খ্যাতিটা শুধু ইকনমিক্সের জন্য নয়, যে খ্যাতিটা সবচেয়ে বেশি শুনতাম তখন সেটা হচ্ছে - কারণ আমিও করতাম তখন কলেজের বিতর্ক - ডিবেটিং। কলেজ ডিবেটিং সোসাইটিতে আমি খুবই অংশগ্রহণ করতাম - ইংরেজী, বাংলা দুটো ডিবেটেই; তো সেই ডিবেটিং সার্কেলে সবসময়ে শুনতাম যে এরকম ডিবেটার আর হয় না, সে হচ্ছে অমর্ত্য সেন। উত্তর জীবনে ওঁর তার্কিক পারদর্শিতার অবশ্য অনেক পরিচয় পেয়েছি।

পড়শী ঃ ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে যে মন্বন্তর হয়েছিল, সেটা বিভিন্ন সূত্রে শোনা যায় অমর্ত্য সেনকে বেশ গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল - তাঁর জীবন এবং পরবর্তীকালের কাজ ও চিন্তাধারাকে। সে বিষয়ে একটু যদি বলেন।

প্রণব ঃ উনি তো অনেক জায়গাতেই ওঁর জীবনের দুটো ঘটনা নিয়ে বলেছেন, যে দুটো ঘটনা ওঁর ছোটবেলার জীবনের, ওঁর কাজকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছে। একটা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, অন্যটা হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া এবং মারামারি। দুর্ভিক্ষ নিয়ে তারপরে তো উনি অর্থনীতিতে একটা পুরো নতুন দিকে কাজ শুরু করলেন। তার বইও বেরোলো, এমনকি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যে বিজ্ঞপ্তি হয় সুইডেন থেকে, তাতেও সেই বইটার উলে-খ আছে। দুর্ভিক্ষ ওঁর মনে একটা খুবই ধাক্কা দিয়েছিল, যে কেন - ফসল এমন কিছু একটা কম হয়নি ঐ বছরে, অথচ এত লোক মরে গেল - বিশেষতঃ গরীবেরা। ঐ সময়ের কথাতে আমি বইতে পড়েছি যে মৃতদেহ বা প্রায় মৃতদেহ টপকে টপকে বাঙালিরা সিনেমা, থিয়েটার দেখতে যেত। অর্থাৎ উচ্চবিত্তদের অতটা ক্ষতি হয়নি। ব্যাপারটা শুধু অমর্ত্য সেনকেই নয়, পুরো বাঙালির মানস জগৎকে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছে। তারপরে ছবি, সাহিত্য, নাটক এই সব জগতেও দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর নানা ভাবে আসতে থাকে ঐ সময়ে।

পড়শী ঃ আরেকটা ঘটনা ছিল কাদের মিঞার?

প্রণব ঃ হ্যাঁ, সেটা তো ঢাকার বাড়িতে দেখেছেন, ওঁদের বোধহয় পাশের বাড়িতে কাজ করতে এসে ছুরিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। বিভিন্ন জায়গায় বারবার এই ঘটনার উলে-খ করেছেন। বোঝাই যায় অল্পবয়স্ক একটি ছেলে, সে একটা দেখেছে এইরকম, যাকে সে চেনে - এটি ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে আজ পর্যন্ত ওঁর একটা বড় প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে কিছু লোক আমাদের এই ভাবনাগুলোকে এমন ভাবে চালিত করে এবং ইতিহাসের একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ ব্যাখ্যাকে আমাদের প্রধান ঐতিহ্য বলে চালাতে চায়। কিন্তু ওঁর বই Argumentative Indian-এ উনি দেখাচ্ছেন, এই যে হিন্দুত্বট্রাডিশন সেইটা ভারতবর্ষের একমাত্র বা প্রধান ট্রাডিশন নয়। আরো কত রকমের ঐতিহ্য উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংস্কৃতির বহুমুখিতা - এগুলোতে অনেক বেশী জোর আছে। আমিও যা দেখেছি তাতে বইটাতে প্রধান বক্তব্য যেটা অমর্ত্য সেন বলতে চান তার একটা বড় অংশ হচ্ছে যে দু' ধরণের লোক ভারতবর্ষের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদিকে ভুলভাবে দেখিয়েছে। এক হচ্ছে উগ্রপন্থী - যারা একেবারে একটা খুব সংকীর্ণ ভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে। উগ্রপন্থীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই আছে। হিন্দুত্ববাদীরা খারাপের উদাহরণে আওরঙ্গজেবের কথা বলেন, অমর্ত্যদা বলেছেন খালি আওরঙ্গজেবকে দেখালে কি করে হবে - আকবরকে দেখো, অন্যরকম। আকবর বিভিন্ন ধর্ম সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং খালি একটা দিকে দেখালেই হবে না, এটাই হচ্ছে ওনার বক্তব্য। অন্যদিকে পশ্চিমের লোকদের সম্বন্ধে উনি বলেছেন যে পশ্চিমে ভারতবর্ষের কথা ভাবলেই যে রূপমূর্তিটা প্রধান সেটা এই যে ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক, ধর্ম টর্ম নিয়েই থাকে, আর যত বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী ঐতিহ্য এগুলো সব পশ্চিমে। উনি বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতের গত দুহাজার বছরের ইতিহাস থেকে উনি অনেকের নাম করেছেন যারা বিজ্ঞান ও গণিতে একেবারে বিরাট। উনি যেমন আর্যভট্টর নাম করেছেন। পশ্চিম ইউরোপে গ্যালিলিও, কোপারনিকাস এঁদের সময়ে এই ধারণাটা এল যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, আর্যভট্ট সেই রকম কথা অনেক আগেই পঞ্চম শতাব্দীতে (5th Century A.D.)-তে আলোচনা করেছেন। গণিতে, রাশিতত্ত্বে একটা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভারতবর্ষে রয়েছে। হ্যাঁ ভারতবর্ষে ধর্ম রয়েছে, ধর্ম মানেই এই নয় যে আমার ধর্মটাই শ্রেষ্ঠ, অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করি না। ভারতে অনেকগুলো ধর্মতেই যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মে অন্য ধর্মের সম্বন্ধে ঔদার্য্যের কথা বলা হয়েছে। দু'নম্বর হচ্ছে আমরা ভাবি নাস্তিক (atheist)-এর ট্রাডিশান বুঝি পশ্চিমে, উনি দেখাচ্ছেন যে দুহাজার বছর ধরে একটা লম্বা ঐতিহ্য হচ্ছে আমাদের নাস্তিকবাদ। ওটাকে ভারতীয় দর্শনে বলে লোকায়ত দর্শন। লোকায়ত দর্শনে ওরা ভগবানে বিশ্বাস করেনা, সেই ঐতিহ্যের একজন নামকরা ব্যক্তি চার্বাক। একটা প্রশ্ন করার ঐতিহ্য ছিল, একটা ঔদার্য্যের ঐতিহ্য ছিল, যে আমরা অন্যদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাব। আমি আমার ধর্মে বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্যকে নীচু করব না। এই দুটোতেই অমর্ত্যদা জোর দিয়েছেন। তারপরে বলেছেন গণতন্ত্রের ব্যাপারে। পশ্চিমের ধারণা গণতন্ত্র ব্যাপারটা পশ্চিমের অবদান, গ্রীক সভ্যতা থেকে, তারপরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং এদেশে। অমর্ত্যদা বলেছেন গণতন্ত্রের একটা ধারণা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছিল আগেই। উনি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাচ্ছেন, বৌদ্ধ ধর্মে যেমন বলা হয় 'সজ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। সজ্ঘ হচ্ছে সবাই মিলে, বৌদ্ধ ধর্মে বলা আছে কোন সমস্যা হলে সবাই মিলে আলোচনা করব। বিজ্ঞান, নাস্তিকবাদ, গণতন্ত্র - এই তিনটেকে বলা হয় পশ্চিমের দান। হ্যাঁ, পশ্চিমে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রাচ্যে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষেও এগুলি ছিল। উনি বলেছেন যে বহু জিনিস তোমাদেরও ঐতিহ্য ছিল, আমাদেরও ছিল, তোমরাও করেছ, আমরাও করেছি। এই বার্তাটি উনি বারে বারে দিচ্ছেন।

পড়শী ঃ আপনারা দু'জনে একসঙ্গে কি কোনো প্রজেক্টে কাজ করেছেন বা একসঙ্গে কোনো পেপার করেছেন?

প্রণব ঃ কোনো রিসার্চ প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করিনি, পেপারও লিখিনি, কিন্তু কাছাকাছি বিষয় নিয়ে কাজ করেছি। উনি অর্থনীতির যে দিকটায় বেশ খানিকটা কাজ করেছেন, সে দিকটা আমি নিজে বিশেষ যাইনি। ইকনমিক্সে যেটাকে বলে Social Choice Theory সেদিকে গেছেন, আমার নিজের বিষয় সে দিকটা নয়। আমাদের হাজার হাজার লোকের নিজস্ব মত আছে সেগুলিকে কিভাবে একত্রিত করা যায় যাতে সামাজিক নীতি নির্ধারণে একটা পারস্পরিক সঙ্গতি এবং যুক্তি থাকে অথচ ব্যক্তির অধিকার খন্ডন করা হয় না, এসবই হচ্ছে Social Choice Theory-র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ওঁর ইকনমিক্সের নোবেল প্রাইজের প্রধান বিষয়টা হচ্ছে Social Choice Theory। প্রাইজের বক্তব্যে অবশ্য ওঁর দুর্ভিক্ষের উপর কাজের এবং দারিদ্র সম্পর্কিত অনেক ব্যাপারও ওরা উলে-খ করেছে, কারণ উনি এসব জিনিস নিয়ে কাজ করেছেন।

পড়শী ঃ আপনার যেদিকে কাজ সে দিকটার সঙ্গে এটার কতটা মিল আছে?

প্রণব ঃ তার সঙ্গে যোগ তো নিশ্চয়ই আছে। আমি বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করছি, তবে একটা কাজ Social Choice Theory-র সঙ্গে একটুখানি জড়িত। আমার একটা বই আছে -The Political Economy of Development in India; ছোট্ট বই, বহুদিন আগে লিখেছিলাম, ১৯৮৪ সালে। আমি Oxford-এ Radhakrishnan মেমোরিয়াল লেকচার দিয়েছিলাম, Radhakrishnan যখন Oxford-এ ছিলেন একটা কলেজে, তার স্মরণে। তারপরে ওটা একটা

বই আকারে বেরোয়। বইটার কথা বলছি এই জন্যে যে Political Economy হচ্ছে যে আমরা কেন - পুরো দেশের পক্ষ থেকে কতগুলো জিনিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আর কতগুলো জিনিস নেওয়া হয় না। কতগুলো জিনিস আমরা সবাই নিজেরা মনে করি যে এইটা করলে ভাল হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই দিকে যাচ্ছে না অন্য দিকেই যাচ্ছে। আমি সেইটার কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছি যে কেন কতগুলো জিনিস করলে ভাল হ'ত অথচ করা হয় নি। তার উপর যারা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাবান তারা কি ভাবে ভিন্নমতকে মেলানোর চেষ্টা করে। এটার একটা সম্পর্ক আছে social choice-এর সঙ্গে। এছাড়া আমার কাজের সঙ্গে ওঁর কাছাকাছি কাজগুলো প্রধানত দারিদ্র ও উন্নয়ন সম্পর্কেই। বহুকাল ধরেই আমার কাজের একটা অংশ ছিল যে আমাদের মতো দেশে যখন উন্নয়নও হয় তখনো কেন মেয়েদের অবস্থা এত খারাপ থাকে। অনেকদিন আগে সেটা লিখেছি, আমি উদাহরণ দিয়েছি যেমন আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোয় এটা দেখা যায়। বিশেষ করে পাঞ্জাব ও হরিয়াণাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক হয়েছে, বিশেষ করে সবুজ বিপ-ব ইত্যাদি পাঞ্জাবে হওয়ার ফলে, ওদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি পশ্চিম বাংলার বা তামিলনাড়ুর তুলনায়। অথচ, আমরা যদি দেখি যে মেয়েদের প্রতি ব্যবহার, আমি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছি এ নিয়ে, শিশুদের - ছেলেদের আর মেয়েদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য। এর চূড়ান্ত উদাহরণ হচ্ছে যে বাচ্চা মেয়েরা অনেক বেশি মারা যায় বা উপেক্ষিত হয়। অনেকদিন ধরে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, গুজরাট - যারা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে আছে ভারতবর্ষের আরো অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায়, তাদের মধ্যেও কন্যা শিশুর মৃত্যুর হার দেখলে দেখা যায় অনেক বেশি।

পড়শী ঃ একটু interrupt করছি, এই data গুলো কি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এজেন্সীরা collect করেছেন না এদেশের অরগানাইজেশন collect করেছেন?

প্রণব ঃ আমি যখন কাজ করেছি, বা অমর্ত্যদা যখন কাজ করেছেন তখন সবই ইন্ডিয়ান census এর তথ্য থেকেই পাওয়া। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে ডেটা বা সংখ্যার হিসাব ভালই পাওয়া যায়। সংখ্যাবিজ্ঞানের (Statistics) একটা ঐতিহ্য আছে -দু ধরণের তথ্য (ডেটা) পাওয়া যায় census ডেটা এবং Sample Registration Statistics। অর্থাৎ জন্ম বা মারা গেলে রেজিস্ট্রেশান করতে হয়, সবাই করে না, কিন্তু ওরা নমুনা বা স্যাম্পেল করে ঘুরে বার করে। এখন একটা আরো বড় সমীক্ষা বা সার্ভে হয় ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভে। পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে উত্তর এবং পশ্চিমে কন্যা শিশুর মৃতুর হার পুত্র শিশুর তুলনায় অনেক বেশি।

পড়শী ঃ এই ট্রেন্ডটা কি কমেছে না একই রয়েছে না বাড়ার দিকে যাচ্ছে?

প্রণব ঃ কমছে না। বরাবরই দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণে এই তারতম্য অনেক কম। এখন আমি সেগুলি বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি তো খালি মৃত্যুর হার নিয়ে কাজ করছি, অমর্ত্যদা gender issue নিয়ে অনেক দিক দিয়ে কাজ করছেন। উনি বলছেন একটা দেশকে আমি উন্নত বলব না, যতক্ষন পর্যন্ত women's autonomy বা নারীদের স্বাবলম্বন একটা লেভেলের উপর না উঠে। ওনার একটা বই আছে এগুলো নিয়ে Development as Freedom বলে। সেই বইতে দেখাচ্ছেন যে আমাদের সমাজে মেয়েরা এবং আরেকটা অংশ যারা শিক্ষা পায়নি, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে আছে, এদের একটা মৌলিক স্বাধীনতা না থাকলে ... যে আমার রোগ হয়েছে আমি তার প্রতিকার চাই - এটা প্রত্যেকের একটা মৌলিক অধিকার; তেমনি আমি পড়তে চাই - মৌলিক অধিকার; নিজের স্বাবলম্বী হওয়া সেইটাও মৌলিক অধিকার। এই বেসিক রাইটগুলো না থাকলে অথচ মাথাপিছু আয় অনেক বেড়ে গেল, তাহলে সেই দেশকে উনি উন্নত বলছেন না। বলছেন ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন বলতে মাথা পিছু আয়ের দিকে তাকাব কিন্তু এইগুলোও থাকতে হবে। এইটা উনি অনেকদিন ধরে করছেন, Development as Freedom পুরো বইটাই প্রায় এটার উপর। এ বিষয়ে একটা ব্যবহারিক দিকও আছে, উনি কিছু বন্ধুর সঙ্গে মিলে বিশেষ করে United Nations Development Program-এর লোকজনকে উনি বুঝিয়েছেন, যে তোমরা খালি মাথাপিছু আয়ের দিকে না তাকিয়ে বা একটা দেশে উন্নয়নের হার কতটা হল - খালি সেটার দিকে না তাকিয়ে, অন্য আরো কতগুলো জিনিসের দিকে তাকাও, তবেই ঠিক কর এই দেশটা সত্যিই এগোচ্ছে কিনা। ওঁর কথা শুনে United Nations কতগুলো সূচক তৈরি করল। অমর্ত্যদার উৎসাহেই ওরা একটা সূচক ঠিক করল যাকে Human Development Index বলে, আয় ছাড়াও স্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দিকে কতটা উন্নতি হয়েছে, সেটাই এখন উন্নয়ন মাপতে সবাই ব্যবহার করে।

পড়শী ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বায়ন এবং দারিদ্র নিয়ে অমর্ত্য সেনের কাজ ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

প্রণব ঃ বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নন উনি, যদ্দুর আমি জানি যে উনি মনে করেন বিশ্বায়ন অনেক নতুন দরজা খুলে দিতে পারে, এমনকি গরীবদেরও অনেক সুযোগ দিতে পারে। আমিও সেটাই মনে করি। অনেকেই দেখি খুব গালমন্দ করেন, যে গরীবদের খুব খারাপই হবে, দু' দিকেই উদাহরণ আছে। বাংলাদেশে অনেক কমবয়েসী মেয়েরা আগে তারা বাড়ি থেকে বেরোতো না, অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত, এখন এই গারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে তারা জামাকাপড় বানায়, সেগুলো বিদেশে বিক্রী হয়। তাতে প্রচুর মেয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছে, কারণ একটা আয় হচ্ছে। এটা বিশ্বায়ন না থাকলে হত না, কারণ এর বেশির ভাগ জামাকাপড়ই বাইরে যাচ্ছে। এই রকম অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যেখানে বিশ্বায়নের ফলে গরীবদের সুযোগ বেড়েছে। আবার অনেক উদাহরণও আছে, বিশ্বায়নের ফলে গরীবদের অসুবিধা হতে পারে। একজন গরীব, সে একটা কারখানায় কাজ করে, কিন্তু সেই কারখানাটা পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারল না, অন্য একটা দেশের জিনিস এসে সেই জিনিসকে হটিয়ে দিল বাজার থেকে। তাহলে তার চাকরী চলে যাচ্ছে, সেখানে একটি গরীব শ্রমিকের তো অসুবিধা হতেই পারে। সুতরাং বিশ্বায়ন বলেই তো খারাপ/ভাল একরকম বলার অর্থ হয় না। বিশ্বায়নে অনেক নতুন সুযোগ আসে, বিশ্বায়নটাকে ব্যবহার করতে হলে, আমাদের দেশে কতগুলো জিনিস পাল্টাতে হবে। বিশেষ করে উনি এটাতে জোর দেন - বিশ্বায়নের ফলে কতগুলো প্রবণতা হয় আর্থিক অসাম্য বেড়ে যাওয়ার, অর্থাৎ লোকের মধ্যে কারো বেশি opportunity আর কারো একদম নেই, যেন 'কারো

পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'। দেখা যাচ্ছে অনেক দেশেই এমনকি অর্থনৈতিক আয়ের দিক দিয়ে এই বৈষম্যটা বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি একটা পত্রিকাতে অমর্ত্যদা বলেছেন, "আমি যা দেখছি এ বৈষম্যটা যদি আমরা না থামাতে পারি, তাহলে মনে হবে ভারতবর্ষের শতকরা দশভাগ লোক যেন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকছে, আর শতকরা নব্বই ভাগ আফ্রিকায় থাকছে।" আমাদের দেশটা দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে; এই বৈষম্যটা কমাতে হলে, বিশ্বায়নকে থামিয়ে নয়, ওটার জন্য দেশের ভিতরে কতগুলি জিনিস করতে হবে, তার জন্য তিনটে জিনিস বলেছেন উনি - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর মেয়েদের অটোনমি বা স্বাবলম্বন। উনি এটা নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। এখন তো নোবেল প্রাইজের টাকা দিয়ে উনি একটা ট্রাস্ট করেছেন প্রতীচী ট্রাস্ট। ওঁর প্রতিষ্ঠানটা শান্তিনিকেতন থেকে চালানো হয়, সেখান থেকে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ওখানে কাজ করে যারা গিয়ে সার্ভেগুলো করছে। এককেটা গ্রামে সার্ভে করে শিক্ষার কি অবস্থা, স্বাস্থ্যের কি অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে। তারপরে সেই সার্ভের রেজাল্ট নিয়ে রিপোর্ট তৈরী হয়। ওঁর রিপোর্টে উনি অনেক জায়গায় স্বাস্থ্যের বা শিক্ষার কি কি উন্নতি প্রয়োজন বা কি কি গাফিলতি রয়েছে, এটা যখন রিলিজ করেন তখন সরকারও নড়েচড়ে বসে কিছু করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে উনি খুবই উদ্যমী। আমি এই যে সপ্তাহ দুয়েক আগে দেশে গিয়েছিলাম, উনিও গিয়েছিলেন, তখন দেখলাম উনি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মিলে শুরু করলেন একটা ভারতবর্ষে পাবি-ক হেল্থ স্কুল। কারণ ভারতবর্ষে এখন অনেকগুলো বিজনেস স্কুল হয়েছে, কিন্তু এদেশে যেমন School of Public Health আছে, সেরকম নেই। প্রধানমন্ত্রী এটা শুরু করেছেন, কিন্তু উনি তাদের বোর্ডে আছেন। একটা অনুষ্ঠানে ওঁরা ঘোষণা করলেন যে কতগুলো Public Health Institute করা হবে, তাতে প্রধান কাজটা হবে জনস্বাস্থ্যের উপর। প্রাইভেট ব্যবস্থায় আমার অসুখ হলে আমি পয়সা থাকলে গিয়ে ভালো ডাক্তারকে দেখালাম, নার্সিং হোমে গেলাম, বা ওষুধ দিল। কিন্তু সেই জিনিসটাতো গরীবেরা পারেনা, গরীবদের জন্য জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর দ্বিতীয়তঃ কতগুলো জিনিস রুগীর একার ব্যাপার নয়। চারদিকে স্বাস্থ্যের পরিবেশটা পাল্টাতে হবে, আজকে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ বাচ্চা মরে যাচ্ছে কারণ জলে নানা রকমের জীবাণু, জলের দূষণ একটা বড় সমস্যা। কেন জলের এই অবস্থা? কেননা ভারতবর্ষের বহু বাড়িতে এখনো কোনো টয়লেট নেই। তাহলে আশেপাশের সমস্ত ময়লা গিয়ে পড়ছে যে পুকুরে, সেই পুকুরের জলই লোকে খাচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের আলোচনার বিষয়। Public Health-এর দুটো aspect আছে, একটা হচ্ছে পাবি-ক হসপিটাল, আরেকটা হচ্ছে পাবি-ক হাইজিনকে ইম্প্রুভ করার ব্যাপারগুলো। সেগুলো নিয়েই গবেষণা করতে হবে, কারণ আমাদের দেশের অসুখগুলো আর এদেশের কিছু কিছু অসুখ এক নয়। কতগুলো অসুখ আমাদের মতো দেশে বেশি হয়, সেগুলো নিয়ে এই দেশে গবেষণা হয় না, সেগুলো নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি করার জন্য School of Public Health-এর ব্যাপারে উনি উৎসাহ দেখিয়েছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীদের স্বাবলম্বন - এই তিনটে ব্যাপারে শুধু গবেষণা নয়, উনি বার বার ভারতবর্ষে গিয়ে এই ব্যাপার গুলোতে কাজ করানোর চেষ্টা করছেন।

পড়শী ঃ জনসংখ্যা কি কোন ফ্যাক্টর এই সবের সাথে?

প্রণব ঃ উনি এ নিয়ে লিখেছেন, ওঁর মত হচ্ছে যে জনসংখ্যার সমস্যাটা কমানোর জন্য একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে মা'র শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। কেননা মা যেখানে শিক্ষিত, যাঁর মানে অন্তত স্কুলের পড়াশুনা আছে, স্বাস্থ্য সর্ম্পকে কতগুলো ন্যুনতম পদ্ধতি জানতে পারেন তাঁরা, যেমন জলটা ফোটাতে হবে, বা এটা করলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে, ওটা করলে ভাল হবে ইত্যাদি। উনি কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছেন - যে জনসংখ্যা কমানোর জন্য চীন কি করল আর আমাদের দেশ কি করল। চীন একটা খুব উগ্রনীতি নিল যে এক একটা পরিবারে একটির বেশি বাচ্চা হতে পারবে না, ওয়ান চাইল্ড পলিসি, প্রায় পুরো দেশেই যদিও গ্রামাঞ্চলে ওরা কিছু কিছু ছাড় দিয়েছে। জনসংখ্যা বাড়বার হার চীনে অনেক কমে গেছে, আমাদের চেয়ে অনেক কম। ভারতবর্ষে উনি বলেছেন যে অনেকগুলো জায়গায় জনসংখ্যার বাড়ার হার খুবই বেশি - বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু উনি উদাহরণ দিচ্ছেন - কেরালাতে এত কম কেন? কেরালাতে মেয়েদের শিক্ষার হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক ভাল। অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের তুলনায় সবারই শিক্ষা কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা বিশেষ করে অনেক বেশি এগিয়ে আছে, সেটা আজকে নয়, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই। তার জেরটা পড়েছে স্বাস্থ্যে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে কেরালা। যদিও মাথা পিছু আয় বা উন্নয়নের হারে কিন্তু কেরালা একদম উপরে নয়। পাঞ্জাব, হরিয়াণার তুলনায় কেরালার সাধারণ মানুষের আয় অনেক কম। অথচ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক বেশি। উনি দেখাচ্ছেন যে চীন একটা চরম নীতি নিল, একেবারে ওয়ান চাইল্ড পলিসি। কেরালায় সেটা করতে হয়নি। কেরালা মেয়েদের এডুকেশনে এবং স্বাস্থ্যের দিকগুলোয় ভাল করাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম। যা দিয়ে বোঝাচ্ছে তাহলে যদি কতগুলো জিনিস যেমন শিক্ষা স্বাস্থ্য - উনি যেগুলো বলেছেন সেগুলো করলে, জনসংখ্যার ব্যাপারটা ভাবতে হবে না, কারণ মানুষ বাচ্চা ভালভাবে বড় হোক সেগুলি চায়, কিন্তু অনেকসময় কি হয়, মেয়েরা নিরক্ষর, তারা স্বাস্থ্যের জন্য কি করতে হবে সেগুলো জানে না, আর দ্বিতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হলে চারটে বাচ্চা হলে দুটো বা তিনটে মরে গেল, তাহলে যে চায় তার দু'জন বাচ্চা চাইছে তার যদি একটা বড় অংশ মরে যায়, তাহলে তার জনসংখ্যাবৃদ্ধি আরো অনেক বেশি কারণ সে চার পাঁচ জন বাচ্চা করবে, কারণ কে কখন মরে যাবে বলা যায় না। সুতরাং মৃত্যুর হার কিন্তু জন্মের হারকে প্রভাবিত করে। যেসব জায়গায় মৃত্যুর হার কমে গেছে, কেরালায় যেমন, জন্মের হারও কমে গেছে। সুতরাং এর জন্য লোকের ওপর জবরদস্তি করার দরকার নেই। তিনটি মূল বিষয় যদি দেওয়া যায় - শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মেয়েদের সক্ষমতা, তাহলে আপনা থেকেই জনসংখ্যার হার কমে যাবে।

পড়শী ঃ অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাইজ ভারতীয় উপমহাদেশের ইকনমিক্স রিসার্চকে কতটা প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়?

প্রণব ঃ আমি বলব নোবেল প্রাইজের তো নিশ্চয়ই প্রভাব আছে, মানে ভারতবর্ষের অর্থনীতির জগত পৃথিবীর সামনে একটা স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে আমার মনে হয় খালি ওঁর নোবেল প্রাইজের জন্য নয়, অনেক আগে থেকেই ওঁর উদাহরণটা ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন....... **প্রণব বর্ধনের চোখে**

অমর্ত্য সেনের সমাজভাবনা

শ্যামল চৌধুরী

এপ্রিল ২০০৫ এ বার্কলিতে প্রদত্ত অমর্ত্য সেনের 'হিচকক লেকচারের' প্রারম্ভে অধ্যাপক প্রণব বর্ধনের কাছে শোনা একটি সত্য ঘটনা, যা তিনি শুনেছিলেন অধ্যাপক সেনের মায়ের কাছে, পুনরায় ব্যক্ত করছি। শিশু অমর্ত্য সেন গিয়েছিলেন তার মায়ের হাত ধরে একটি ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠানে যেখানে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছিলেন। স্বভাবতই অনুষ্ঠানের শ্রোতারা চুপ করে শুনছিলেন। শিশুসুলভ চঞ্চলতায় অমর্ত্য কিছু বলতে চাইলে মা তাঁকে বলেন, চুপ করতে। অমর্ত্যর জবাব ছিল, আমাকে চুপ করতে বললে, কিন্তু ওঁ (মানে রবীন্দ্রনাথ) কেন কথা বলছে? বহুদিন রবীন্দ্রনাথ নেই, যিনি অমর্ত্যর নামকরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ সাহিত্যিক হলেও সামাজিক বিষয়েও তার স্পষ্ট মতামত ছিল। শান্তিনিকেতনে বড় হয়ে ওঠা অমর্ত্য সেনও মূলতঃ একজন অর্থনীতিবিদ। অমর্ত্যর সমাজভাবনা নিয়ে এ প্রবন্ধ যার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর দুটো বই; The Argumentative Indian এবং Identity and Violence ।

অমর্ত্য সেন ভারতীয় বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন, সম্রাট অশোকের আমলে আয়োজিত "Buddhist Council"-এর মধ্যে যেখানে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছেন সম্রাট আকবরের পৃষ্টপোষকতায় আয়োজিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপে যেখানে আকবর জোর দিচ্ছেন ট্রাডিশনের চেয়ে যুক্তির (the part of reason) উপর। তিনি ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছেন কবীর, নানক ও চৈতন্যের ভক্তিমূলক কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কবিতায়। তিনি ভারতীয় সেকুলারিজমের উৎস খুঁজেছেন সম্রাট আকবরের প-ুরালিষ্ট সমাজব্যবস্থার উপর যেখানে রাষ্ট্র সকল ধর্ম থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে এবং tolerance-কে উৎসাহিত করে। তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক বিষয়ে সহনশীলতার উন্মুক্ত ও অবাধ আলোচনার এবং সেকুলারিজমের ধারণাটি কেবলমাত্র পশ্চিমা ট্রাডিশনের একচেটিয়া নয় বরং ভারতেও এই সব ধারণার স্বাধীন উন্মেষ ঘটেছিল। অ্যারিষ্টোটলের রচনায় তিনি দেখেন সকল মানুষের (পড়ুন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য - নারী এবং দাসদের জন্য নয়) জন্য স্বাধীনতা ও সহনশীলতার কথা, ভারতে সকল মানুষের জন্য আরো ইনক্লুসিভ বক্তব্য দেখেন সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে যেখানে সুশীল সামাজিক ব্যবহারের (good behaviour) সঙ্গে সুশীল শাসনব্যবস্থার (good governance) কথা বলা হয়েছে। সামাজিক শৃঙ্খলার কথা প-্যাটো এবং সেন্ট অগাস্টিনের রচনায় যেমন দেখেন, তেমনি দেখতে পান কৌটিল্যের রচনায়।

ভারতের বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হিন্দুত্ব আন্দোলনের উত্থানকে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র বিরাট হিন্দু জনসংখ্যা ও তিন হাজার বছরেরও বেশী সময়ের হিন্দু ঐতিহ্যই ভারতীয় মানসের পরিচয় বহন করে না। ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের বৃহৎ মহীরুহসম অবদানকে কিছুমাত্র খাটো না করেও বলা যায় যে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও স্থাপত্যে ইসলাম, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাব রয়েছে। আজকের ভারতে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপতি, শিখ প্রধানমন্ত্রী ও খ্রীষ্টান বংশোদ্ভুত পার্টি প্রধান ভারতীয় প-ুরালিষ্ট সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের মত কোন কোন পশ্চিমা গবেষক ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যা দিতে চান। তাঁদের একজন Samuel Huntington -এর The clash of civilization গ্রন্থের থিসিস তিনি খন্ডন করেন। Huntington অতিমাত্রায় সরলীকরণ করে পৃথিবীকে হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করতে চান। তিনি দেখান যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান ছাড়া যে কোন মুসলিম প্রধান দেশের চাইতে বেশী। অধ্যাপক সেন একক মানুষের বা জনগোষ্ঠীর ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের বিরোধী কারণ এই পরিচয় সর্বগ্রাসী ও এক্সক্লুসিভ রূপ ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি মৌলবাদের বিষয়টি পরীক্ষা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেন, যারা ইসলামের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চান, তারা ধর্মীয় গৌরব ছাড়াও আরবের তথা মুসলমানদের বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্রে মৌলিক অবদানের ঐতিহ্য কেন উজ্জীবিত করতে চান না; শুধুমাত্র ধর্ম বা রাজনীতির উপর জোর দেওয়ার কারণে বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো যেন ছেড়ে দেয়া হচ্ছে 'পশ্চিমা দেশগুলোর' কাছে। আর মুসলিম অধ্যুষিত আরব দেশগুলো যে ধর্মের শুদ্ধতার অন্বেষণে ব্যস্ত। আজকের রাগী ও ক্ষুব্ধ আরব যুবক যদি ধর্মের শুদ্ধতার কথা ছাড়াও বহুমাত্রিক আরবীয় ঐতিহ্যের উপর জোর দিত, তাহলে তাকে একক ধর্মীয় পরিচয়ের নিগড়ে আবদ্ধ করা যেত না। অপরদিকে পশ্চিমা শক্তিসমূহ ধর্মের পরিচয়কে মূখ্য করার কারণে ধর্মীয় নেতারাই হয়ে যাচ্ছেন যেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের একমাত্র মুখপাত্র। বহু মুসলমান তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর যে ধর্মীয় নেতাদের উচ্চকিত কণ্ঠের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় পরিচয়ের লেবেল সাঁটার পাশাপাশি এখন শুরু হয়েছে 'মডারেট মুসলিম' খোঁজার প্রচেষ্টা। অধ্যাপক সেনের প্রশ্ন মডারেশনটা কিসে? ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরতায় নাকি রাজনৈতিক সহনশীলতায়? একজন মানুষ গভীর ধর্মবিশ্বাসী হয়েও রাজনীতিতে সহনশীল হতে পারেন। যেমন সম্রাট সালাদিন দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের সময় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কারণে এবং একই সঙ্গে বিখ্যাত ইহুদী দার্শনিক মাইমনাইডসকে আশ্রয় দেন নিজ রাজসভায়, কারণ তিনি ইউরোপের গোঁড়া ও অসহনশীল পরিবেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোগল সম্রাট আকবর যখন বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে, তখন রোমে রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী গিরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আকবর তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে লিবারেল পলিটিকস চর্চা করেছেন; তার ধর্মবিশ্বাস তাকে

বাধাও দেয়নি বা অনুপ্রাণিতও করেনি।

অধ্যাপক সেন মনে করেন বর্তমান সংঘাতময় পৃথিবীতে একক ধর্মীয় পরিচয় পৃথিবীকে আরো সংঘাতময় করে তুলবে। তিনি মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়ের কথা বলেছেন, যা একক ধর্মীয় পরিচয়ের আদিম বিষ থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করবে। স্বাধীন পরিচয়ের অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। বহু মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের চাইতে এথ্নিক পরিচয়কে সামনে আনতে চান। তেমনি অনেক মানুষ শ্রেণী পরিচয়কে সর্বাগ্রে আনতে চান। কেউবা পেশাভিত্তিক পরিচয়কে। এরকম বহুমাত্রিক পরিচয়ের প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন একজন বাংলাদেশী মুসলমান একই সঙ্গে বাংলাদেশী ও বাঙালি, একইভাবে গর্বিত বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্পর্কে। একই বিশ্বাসে বলতে হয় বাংলাদেশী মুসলমানের অন্যান্য পরিচয়ের কথা যার ভিত্তি হতে পারে শ্রেণী, লিঙ্গ, পেশা, বা রাজনীতি বা অন্যকিছু। ভুললে চলবে না পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশের বিভক্তি হয়েছিল যদিও দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। বিভক্তির কারণগুলো ছিল, ভাষা, সাহিত্য, ও রাজনীতি সংক্রান্ত। স্মরণ করা যেতে পারে এ ধরণের একপেশে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই বাংলাদেশের নাম সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকায় উঠেছিল।

এই বিশ্বায়নের যুগে অমর্ত্য সেন 'multi-culturalism' নিয়ে ভাবছেন। তিনি বৃটেন এবং আমেরিকাতে পড়াশোনা এবং পেশাগত কাজে নিয়োজিত আছেন ১৯৫৩ সাল থেকে। তিনি দেখেছেন কিভাবে ক্রমান্বয়ে বৃটেন এবং আমেরিকা অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে বরণ করে নিয়েছেন। ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করেছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কাজের সুবিধাদি অভিবাসীদের জন্য। একটি জনপ্রিয় প্রবাদ 'Love thy neighbor'-এর প্রসঙ্গটি তিনি উলে-খ করেছেন। ব্যক্তিজীবনে এই নীতির প্রয়োগ সহজ ছিল, যখন প্রতিবেশী একই জনগোষ্ঠীর (ethnic) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটেন এবং আমেরিকাতে ব্যাপকহারে অভিবাসন হওয়ার কারণে প্রতিবেশী আর নিজের মত দেখতে নয়, নিজের এথনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রায়শই প্রতিবেশী ভিন্ন দেশের বা সংস্কৃতির অন্তর্গত। এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার এবং তাদের বিশ্বাস - অবিশ্বাস সম্পর্কে জানার। আমেরিকা বা ইউরোপে multi-culturalism এর বিরোধীও কম নেই। যেমন Huntington এর ভাষায় multi-culturalism at home threatens the United States and the West'। এরকম বিরোধীতা সত্ত্বেও Diversity বৃদ্ধির জন্য আমেরিকাতে Diversity Visa Lottery Program চালু রয়েছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে তুলনামূলকভাবে কম জনসংখ্যার এথনিক গোষ্ঠীসমূহকে আমেরিকাতে অভিবাসনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর স্বল্পতা হেতু পশ্চিমা দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কর্মী আমদানী করবে। সে কারণে multi-culturalism বন্ধ হবার নয়। তবে multi-culturalism কী রূপ নেবে তাই বিবেচ্য। সেটা কী কেবল বিভিন্ন কালচারকে সহ্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? অভিবাসীরা কি তাদের সন্তানদের উপর পূর্বপুরুষের কালচার চাপিয়ে দেবে নাকি কালচার এবং লাইফস্টাইল প্রশ্নে শিক্ষার স্বাধীন বিচার বিবেচনার ও পছন্দের অধিকার দেবে? প্রতিটি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ বর্জনের ধারা অব্যাহত থাকবে? এদিকে একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকাতে অভিবাসীদের দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বিয়ে হচ্ছে অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। অমর্ত্য সেন বিভিন্ন অভিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক বা সামাজিক আলোচনায় ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করার বিরোধী। তিনি মনে করেন রাজনীতিতে ধর্ম প্রবেশ করার ফলে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়েছে, আর নয়। ধর্মীয় নেতাদের অসহনশীল বক্তব্য কম্যুনিটির বহু মানুষের পছন্দ নয়। বৃটেনে বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্কুলের পদ্ধতির তিনি বিরোধিতা করেন। কারণ এতে বিভিন্ন কালচারকে জানার পরিবর্তে এলিয়েনিশন বৃদ্ধি করে। অমর্ত্য সেনের সমাজভাবনায় শ্রেণী বা ক্লাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি মনে করেন সকল অসাম্য তা গোত্রভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক বা অন্যকিছুর জন্য হোক না কেন তার মধ্যে শ্রেণীর ভূমিকা কাজ করে। যেমন দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অসাম্য রয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চ শ্রেণীর মহিলারা অপেক্ষাকৃত নীচু শ্রেণীর চাইতে ভালো অবস্থানে। কয়েকটি দেশে মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যা ইউরোপের অনেক দেশে ও আমেরিকাতে মনে হয় সুদূর। দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের উপর গোত্রভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক বা অন্যান্য অসাম্যের চাপ একসঙ্গে কাজ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিতেও ক্লাসের ভূমিকা কাজ করে। দরিদ্র অরক্ষিত মানুষের উপর দাঙ্গাকারীরা বেশী চড়াও হয়। অধ্যাপক সেন ঢাকায় একজন দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষ কাদের মিঞার কথা লিখেছেন যিনি দাঙ্গার সময় কাজের খোঁজে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়েছিলেন এবং দাঙ্গাকারীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর মতে গণমাধ্যম দাঙ্গার রিপোর্টিংয়ের সময় ক্লাসের দিকটা রিপোর্ট করেন না, বিভক্তিমূলক ধর্মীয় পরিচয়ের কথাই শুধু লেখেন। তিনি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের প্রদত্ত affirmative action-এর ক্ষেত্রেও ক্লাসকে বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দেন। কারণ অনেকক্ষেত্রে affirmative action-এর সুবিধাগুলি উপরতলার লোকের কাছেই চলে যায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার অধ্যাপক সেনের একটি গবেষণার বিষয়। নারী অধিকারের অসাম্যের ক্ষেত্রে তিনি ছয়টি বিষয় বিবেচনা করেছেন - (১) Survival inequality, (২) natality inequality, (৩) ownership inequality, (৪) unequal facilities, (৫) uneqnal sharing of household benefits and chores, (৬) domestic violence and physical victimization। তিনি বাংলাদেশে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গ্রামীন ব্যাংক ও ব্রাকের সাফল্যের কথা বলেছেন। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শুধু নারীদের নয়, সমগ্র বাংলাদেশী সমাজের একটি 'basket case' থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির একটি সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসাবে উত্তরণের কথা বলেছেন। মাত্র দু'দশকের মধ্যে শিশু জন্মহার ৬.১ থেকে ২.৯ তে নামিয়ে আনা পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো সম্ভব হয়নি। নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির কথাও তিনি বলেছেন। ❐

শ্যামল চৌধুরী পেশায় প্রকৌশলী।

এপ্রিল ২০০৬
স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া।

অমর্ত্য সেন - কিছু কাজ, কিছু কথা

বাসুদেব বিশ্বাস

১৯৩৩ সালের ৩রা নভেম্বর শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের জন্ম। শৈশবের কিছু সময় ঢাকাতে ও ব্রহ্মদেশে (অধুনা মায়ানমার) কাটালেও স্কুলের পড়াশোনা শুরু হয় বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতীর শিক্ষা সম্পর্কে অমর্ত্য সেন তাঁর স্মৃতিচারণে যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেটা হল বিশ্বভারতীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। ছাত্র-ছাত্রীদের মনের অনুসন্ধিৎসা বাড়ানোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হত। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি যে মূলতঃ এক সূত্রে গ্রথিত সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হত। বিশ্বভারতীতে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে উনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পঞ্চাশের দশক ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বর্ণযুগ। বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতনামা অধ্যাপকরা পড়াতেন। কলেজে তখন পঠন-পাঠনের গুণগত মান পৃথিবীর অগ্রণী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল। এই উচ্চমানের কথা উনি নানা জায়গায় উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বামপন্থী রাজনীতির দিকে ঝোঁক ছিল। দেশের বেশীর ভাগ লোক যে দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চবিত্ত ঘর থেকে এলেও দেশের কোটি কোটি মানুষকে কেন অনাহারে কাটাতে হচ্ছে সেই নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জাগত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের প্রাচুর্য আর একদিকে বিপুল সংখ্যক লোকের দারিদ্র। ছাত্র অবস্থায় উন্নয়নের এই অন্ধকারময় দিকটি অমর্ত্য সেনকে খুব বিচলিত করে। উনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অমর্ত্য সেনের লেখায় দেখি দেশের জনগণের সীমাহীন দারিদ্র, অপুষ্টি ও তীব্র অনাহার নিয়ে আলোচনা। দেখি গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অনাহারের আলোচনা। অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণে দেখি অপুষ্টি আর ক্ষুধা যে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের নিত্যসঙ্গী তার কারণ উৎপাদনের কমতি নয়। সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর রূপায়নের অভাবেই এই ভয়াবহ অবস্থা যে কায়েম হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দেশে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ঐ একই কারণে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও অর্ধাহারে আছে। অর্থনীতির আলোচনায় নৈতিক ভিত্তিকে যে অমর্ত্য সেন সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সে কথা নোবেল পুরস্কারের মানপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ই কিন্তু অর্থনীতির এই দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। জাতীয় আয় বৃদ্ধি উন্নয়নের সূচক নয় যদি না বন্টনব্যবস্থা নীতিসম্মত হয়।

১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেন।

প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আর একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র সুখময় চক্রবর্তী। অমর্ত্য সেনের লেখায় সে সময়ের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অমর্ত্য ও সুখময় তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সুখময় কলেজ স্ট্রীট-এর একটি বই এর দোকান থেকে Kenneth Arrow-র সদ্য প্রকাশিত বই Social Choice and Individual Values এনে সহপাঠীদের দেখায় এবং Arrow'র অসম্ভাব্যতা তত্ত্ব (Impossibility Theorem) নিয়ে আলোচনা করে সকলকে বিমুগ্ধ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য Kenneth Arrow ১৯৭২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। সুখময়ের সাথে অমর্ত্য তারপর একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে যে কফি হাউস সেই কফি হাউসে যান। কফি হাউসের এক জানালার ধারে বসে Arrow-র Impossibility Theorem নিয়ে আলোচনা চলে। উনিশ-কুড়ি বছরের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই দুই তরুণের যুক্তিতর্কে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে কফি হাউস। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাস। শীতের সূর্যালোক এসে পড়েছে জানালার ধারে বসা এই দুই তরুণের মুখের উপর। অমর্ত্য সেনের বর্ণনায় 'I particularly remember one long afternoon in the college street coffee house, with Sukhamay explaining his own reading of the ramifications of the formal results, sitting next to a window, with his deeply intelligent face glowing in the mild winter sun of Calcutta (a haunting memory that would invade me again and again when he died suddenly of a heart attack a few year ago)." (Sen, 2004)

হয়ত ঐ সময়ই ভবিষ্যতের নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের কাছে জনকল্যাণ বিষয়ক অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত হয়।

জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিতে (Welfare Economics) মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বিভাগের তিনটি শাখাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম শাখা Social Choice, দ্বিতীয় শাখা বন্টন এবং তৃতীয় শাখা দারিদ্র। অমর্ত্য সেন তার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই 'জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি'-তে Social Choice এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'সমষ্টিগত চয়ন'। বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, অথবা ভাল-মন্দ বা চয়ন-বর্জন ভিত্তি করে সমষ্টির সামূহিক চয়ন নিয়ে আলোচনাই এই সামাজিক বিদ্যার বিষয়বস্তু। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি বিভিন্ন, তাদের পছন্দ বিভিন্ন। এই বিভিন্ন পছন্দের ভিত্তিতে সমষ্টিগত চয়ন কি সম্ভব? Arrow তাঁর বইতে বলেছেন 'অসম্ভব' এবং অংকের সাহায্যে প্রমান করেছেন তাঁর Impossibility Theorem বা অসম্ভাব্যতা উপপাদ্য। অমর্ত্য সেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপপাদ্যের বিষয়বস্তুকে আলোচনা করেছেন তাঁর ১৯৭০ সালে প্রকাশিত Collective Choice and Social Welfare বইতে। Arrow-র অসম্ভাব্যতাকে সম্ভাব্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন অমর্ত্য সেন। জনকল্যাণ, অসাম্য ও দারিদ্র - এই সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন policy মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Social Choice Theory অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ 'দেশের অবস্থা কেমন?' এই রকম একটা সাধারণ প্রশ্নে সামগ্রিক উত্তর কি হবে তা

যথাযথ ভাবে উত্তর দেওয়া দুরূহ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন পছন্দ, বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন, বিভিন্ন রকমের সুখদুঃখের অনুভূতি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন লোক নিয়ে যে সমাজ - সেই সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে কি পৌঁছানো যেতে পারে? Arrow-র অসম্ভাব্যতা উপপাদ্যের সূত্র ধরেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে সম্ভাব্যতার পথ-নির্দেশ করেছেন অমর্ত্য সেন। কি ধরনের সেই তথ্য? ভূমিহীন মজুর, নিরাপত্তাহীন ভাগচাষী, চব্বিশ ঘন্টার গৃহভৃত্য, অবদমিত গৃহিণী সম্পর্কে নানা ধরনের এই বঞ্চণার তথ্যের সাহায্যে সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত কোন নীতি সম্পর্কে সামাজিক সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তথ্যগত ভিত্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে কল্যাণবিষয়ক অর্থনীতিতে (Welfare Economics) অসম্ভাব্যতা সূচক ফলাফল গুলিকে অপসারিত করা যেতে পারে।

১৯৫২ সালের কফি হাউসের আলোচনা চক্রের সূত্র ধরে আমরা চলে গেলাম ১৯৯৮ সালের নোবেল পুরস্কারের মানপত্রের বিষয়বস্তুর আলোচনায়। ফিরে আসা যাক ১৯৫৩ সালে। বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অমর্ত্য সেন গেলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। ১৯৫৫ সালে কেমব্রিজ থেকে পাশ করলেন বিএ। এরপর এক বছরের মধ্যেই পি.এইচ.ডি থিসিসের কাজ শেষ। কেমব্রিজের নিয়ম কম করে তিন বছর না হলে থিসিসের কাজ শেষ হয়েছে বলে ধরা হবে না। আসল কাজ শেষ - কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নিয়ম। কেমব্রিজ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করলেন। তখন বয়স ২৩ বছরও হয়নি। একেবারে বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ যাকে বলে head of the department। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে পোস্টার পড়ল "শিশুর দোলনা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে 'নতুন অধ্যাপক'কে"। তবে অমর্ত্য সেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দের সাথেই অধ্যাপনা জীবন কাটান। কেমব্রীজে তার থিসিস 'The Choice of Techniques'-এর বয়স কালক্রমে পরিণত বয়সে পৌঁছাল (তিন বছর বয়স)। এই সময় কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে একটা Prize Fellowship-এর জন্য থিসিসটি মনোনীত হয়। কেমব্রিজে ফিরে অমর্ত্য সেন সিদ্ধান্ত নিলেন দর্শন নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করার। সে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। আজ আমরা অমর্ত্য সেনকে বিশ্বের একজন সেরা দার্শনিক হিসাবে দেখি। তার সূত্রপাত হয়েছিল ঐ সময়। দর্শন ও অর্থশাস্ত্র - এই দুটি বিষয়েই অমর্ত্য সেনের অসাধারণ পান্ডিত্যের প্রকাশ আমরা দেখি দারিদ্র ও বৈষম্য নিয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। ১৯৮১ সালে তাঁর বিখ্যাত বই Poverty and Famines প্রকাশিত হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি জাঁ ড্রিজ (Jean Drese)-এর সাথে ক্ষুধা ও বঞ্চণা (hunger and deprivation) নিয়ে তাত্বিক আলোচনা ও সেই সাথে সমীক্ষা করেন। Arrow-র Impossibility Theorem অমর্ত্য সেনকে collective choice সম্পর্কে তাত্বিক গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা দেশের দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, ক্ষুধা ও বঞ্চণা সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করতে সাহায্য করে। কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও বুভুক্ষার মৌলিক কারণ খাদ্যের অপ্রতুলতা নয়। দেশে প্রচুর পরিমান খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ দিনের পর দিন অনাহারে থাকে। খাদ্যবস্তু কেনার পয়সা নাই - অর্থাৎ কোন উপার্জন নাই আয়ের কোন উপায় না থাকায় বাজারী অর্থনীতিতে খাদ্যের উপর কোন অধিকার নাই। দারিদ্র ও অনাহারের কারণ তাদের এই স্বত্ত্বাধিকারের অভাব। অমর্ত্য সেন 'আধুনিক বিশ্বের ক্ষুধা ও অভুক্তির সমস্যা বোঝার জন্য স্বত্ত্বাধিকারের বিশে-ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। স্বত্বাধিকার নিয়ে যুক্তিবাদী বিশে-ষণ রয়েছে Poverty and Famines বইতে। কল্যাণ বিষয়ক অর্থনীতিতে ও দর্শনের ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের অবদান আজ সর্বজনবিদিত। ❐

বাসুদেব বিশ্বাস উটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির অধ্যাপক।

লোগান, উটা
এপ্রিল ২০০৬

অমর্ত্য সেনকে যেমন দেখেছি

সুমন ঘোষ

প্রাচীন গ্রীসে বলা হ'ত নির্লিপ্ত মানুষেরাই Kousumou polites (বিশ্বনাগরিক)-র ধারণার উদ্ভাবক। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকেই আসলে দু'টি সমাজে বসবাস করি - একটি ছোট সমাজে যেখানে আমরা জন্ম গ্রহণ করেছি, অপরটি মানবিক বিস্তৃতি ও দূরদৃষ্টির জগতে, যা কিনা সূর্য পর্যন্ত বিস্তৃত। Kant-এর 'Kingdom of ends' এবং রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার অনুপ্রেরণা ছিল বিশ্বনাগরিকত্ব, এই বিশ্বনাগরিকত্বের ভাবনারই আমরা আরো পরিণতি দেখতে পাই অমর্ত্য সেনের মধ্যে যিনি ইকনমিস্ট, ফিলসফার, Social commentarian....কিংবা শুধু বিশ্বনাগরিক। অবশ্য ওঁর নিজের মতে বিশ্বনাগরিকত্ব কোনো ভাবেই ওঁর বাঙালি বা ভারতীয় অথবা এশিয়ান পরিচয়ের প্রতিবন্ধক নয়।

আমার সুযোগ হয়েছিল ওঁর সম্বন্ধে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর, তখন খুবই কাছের থেকে ওঁকে দেখেছি। শান্তিনিকেতনের বাড়ি এবং কেমব্রিজের মাস্টারস লজ - গৃহ এবং বিশ্ব, দুই জায়গাতেই উনি সমান স্বচ্ছন্দ। ওঁর পান্ডিত্য, যুক্তিবাদ ও বিতর্কের ধারা ১৯৬০ সালে কেমব্রিজের থিসিস "Choice of techniques" থেকে ২০০৫ সালের বই "The Argumentative Indian" পর্যন্ত সমান উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। এই বহু বছর ধরে ওঁর পান্ডিত্যের গভীরতাকে বিস্ময়কর

বললেও বোধহয় কম বলা হবে। বিখ্যাত ইকনমিষ্ট Kennet Arrow-র কথা অনুযায়ী “he is a scholar of unusually wide interests in an era where most economists have become highly specialized”। সোসাল চয়েস থিওরিতে কাজের জন্য উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই কাজটি খুবই technical, ফলে সহজবোধ্য নয়। উনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজের বিভিন্ন মানুষের ভালমন্দের ভাবনা থেকে সমষ্টিগতভাবে সামাজিক ভালমন্দের ভাবনা কিভাবে তৈরী হয় এবং তাতে কি কি সমস্যা হতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রফেসর সেনের সমাধান অন্যান্য অনেক সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করে, যেমন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র ইত্যাদি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে যেহেতু প্রফেসর সেন সাধারণভাবে welfare ইকনমিক্সের উপর কাজ করেন, সেহেতু অনেকেই ওঁকে বিশ্বায়নের বিপক্ষে বলে মনে করেন। কিন্তু প্রফেসর সেন আসলে ভারতের মুক্ত অর্থনীতির সমর্থক। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ৯০ এর দশকের শুরুতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিসেবে যখন ভারতে মুক্ত অর্থনীতি প্রণয়ণ শুরু করেন, অমর্ত্য সেন তাঁকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। উনি উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বাজারের উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিরুদ্ধে। World Bank-এর সমালোচনা করে উনি বলেছিলেন “as the institution which is responsible for a lot of evil in this world”; কারণ এই সংস্থাটি ‘market mechanism’-এর উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল। মনমোহন সিং-এর কোনো কোনো নীতির উনি ওই একই কারণে সমালোচনা করেছেন। ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে ওঁর মতামত মাঝে মাঝেই বেশ বিতর্ক তৈরী করেছে, বিশেষত আরেক বিখ্যাত ইকনমিস্ট K.N. Raj-এর সঙ্গে মিলিতভাবে ওঁর ৬০-এর দশকের কাজগুলি।

ব্যক্তিগতভাবে ওঁর রসবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। শেষ করি ওঁর সম্বন্ধে একটা ছোট্ট গল্প বলে। এক টেলিফোন অপারেটরকে নিজের পদবীর বানান বোঝাতে না পেরে উনি বলেছিলেন “S for Somebody, E for Everybody and N for Nobody”। ❒

সুমন ঘোষ ফ্লোরিডা অ্যাটলান্টিক ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির অধ্যাপক। একই সঙ্গে তিনি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক।

অনুলিখনঃ নবনীতা সেন ও অরুণ দাস
এপ্রিল ২০০৬

অমর্ত্য সেন : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

নবনীতা সেন

- জন্ম - ১৯৩৩ সালের ৩রা নভেম্বর - শান্তিনিকেতনে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন অমর্ত্য।
- পিতা - ডঃ আশুতোষ সেন ও মাতা - অমিতা সেন।
- মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহযোগী ও বিশ্বভারতীর প্রফেসর। মাতা অমিতা সেন ছিলেন এক বিশিষ্ট আশ্রমিক।
- পিতার কাজের সূত্রে শিশুবয়সে বার্মাতে (বর্তমানে মায়ানমার) কিছু দিন কাটান।
- ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে শিক্ষার শুরু, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অমর্ত্য শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর স্কুলে ভর্তি হন। বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠন তখনকার অন্যান্য স্কুলের তুলনায় অনেকটাই আলাদা ছিল, অমর্ত্যর চিন্তা ধারার উপরে বিশ্বভারতীর প্রভাব অনস্বীকার্য।
- বিশ্বভারতীর মুক্ত পরিবেশে মানুষ হওয়া কিশোর অমর্ত্যের মনের উপরে ১৯৪০-এর দশকের দাঙ্গা খুবই প্রভাব ফেলেছিল। বার বার তাঁর লেখাতে উলে-খ পাওয়া যায় দাঙ্গায় মৃত জনৈক কাদের মিঞার কথা। অমর্ত্যর নিজের ভাষায় “The experience was devastating for me, and suddenly made me aware of the dangers of narrowly defined identities, and also of the divisiveness that can lie buried in communitarian politics. It also alerted me to the remarkable fact that economic unfreedom, in the form of extreme poverty, can make a person a helpless prey in the violation of other kinds of freedom:”
- ১৯৪৩-এর মন্বন্তর (গ্রেট বেঙ্গল ফেমিন) অমর্ত্যকে খুবই প্রভাবিত করে। ঐ মন্বন্তরে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন অমর্ত্য লক্ষ্য করেন যে তাঁর সহপাঠী বা আত্মীয় স্বজনদের উপরে ঐ মন্বন্তরের তেমন প্রভাব পড়ে নি, শুধুমাত্র সমাজের দরিদ্রতম অধিবাসীরাই ঐ মন্বন্তরের শিকার।
- ১৯৫৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন, ঐ বছরেই কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পিওর ইকনমিক্সের বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে পড়াকালীন ১৯৫৪ সালে সিনিয়ার স্কলারশীপ ও আডম স্মিথ প্রাইজ, ১৯৫৫ সালে রেনবারি স্কলারশীপ, ১৯৫৬ সালে স্টিভেনসন প্রাইজ ও ১৯৫৭ সালে প্রাইজ ফেলোশিপ পান। কেম্ব্রিজে রিসার্চ শুরু করার এক বছর পরেই, দু' বছরের ছুটি নিয়ে অমর্ত্য দেশে ফিরে আসেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির নতুন ইকনমিক্স বিভাগের চেয়ার নিযুক্ত হন।
- ১৯৫৭ সালে প্রাইজ ফেলোশীপ পেয়ে কেম্ব্রিজে ফিরে যান এবং ফিলোসফি নিয়ে রিসার্চ শুরু করেন। ১৯৫৯-এ কেম্ব্রিজ থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।
- ১৯৬০-৬১ সালে অমর্ত্য ট্রিনিটি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে MITতে আসেন, তারপরে একটি সামার কাটান স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে।
- ১৯৬৩ সালে কেম্ব্রিজ ছেড়ে উনি দিলী স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রফেসর পদে যোগ দেন।

• ১৯৬৪-৬৫ সালে বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ স্কলার হয়ে থাকার সময়ে অমর্ত্য 'ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট'-কে খুব কাছের থেকে দেখেন। সোসাল চয়েস থিওরির এই প্র্যাকটিকাল ফর্ম দেখে ঐ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালে এই বিষয়ে ওঁর বই "Collective Choice and Social Welfare" প্রকাশিত হয়।

• ১৯৭১ সালে দিল্লী ছেড়ে উনি লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে যোগ দেন।

• ১৯৭৭-৮০ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর পদে ছিলেন।

• ১৯৮০-৮৭ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে Drummond Professor of Political Economy পদে ছিলেন।

• ১৯৯০ সালে Senator Giovanni Agnelli International Prize এবং Alan Shawn Feinstein World Hunger Award পেয়েছেন।

• ১৯৯৮-২০০৪ পর্যন্ত কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির Master of Trinity College পদে ছিলেন।

• বর্তমানে হারভার্ড ইউনিভার্সিটির Lamont University Professor এবং Professor of Economics and Philosophy ।

• ১৯৯৮ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

• ১৯৯৯ সালে ওঁকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান পুরস্কার ভারত রত্ন প্রদান করা হয়।

• ২০০০ সালে Eisenhower Medal (USA) এবং Honorary Companion of Honour (UK) সম্মান লাভ করেন।

• ২০০২ সালে International Humanist and Ethical Union-এর তরফ থেকে ওঁকে International Humanist Award দেওয়া হয়।

• ২০০৩ সালে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ওঁকে Lifetime Achievement Award প্রদান করে।

• অমর্ত্য সেনের কয়েকটি বিখ্যাত বই ঃ

Collective Choice and Social Welfare (১৯৭০)
On Economic Inequality (১৯৭৩, ১৯৯৭)
Poverty and Famines (১৯৮১)
Choice, Welfare and Measurement (১৯৮২)
Resources, Values and Development (১৯৮৪)
On Ethics and Economics (১৯৮৭)
The Standard of Living (১৯৮৭)
Inequality Re-examined (১৯৯২)
Development as Freedom (১৯৯৯)
Rationality and Freedom (২০০২)
The Argumentative Indian (২০০৫)
Identity and Violence: The Illusion of Destiny (২০০৬)। ❐

নবনীতা সেন পেশায় পিন্সিপ্যাল অ্যানালিস্ট ও প্রজেক্ট ম্যানেজার।
এল ডোরাডো হিল্‌স, ক্যালিফোর্নিয়া
এপ্রিল ২০০৬

অমর্ত্য বললেন......

১১ পৃষ্ঠার পর

সমস্ত আনুষ্ঠানিক দিকগুলো নতুন ভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

নানা বিষয়েই আনুষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। যেমন HIV এপিডেমিকের জন্য যে নতুন ওষুধগুলো বের হয়েছে তার সামগ্রিক ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে patent laws–এর কিছু পরিবর্তন দরকার। আরেকটি সমস্যার কথা বলি। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বাজারে armament বা অস্ত্রশস্ত্র যা বিক্রী হয়, তার শতকরা ৮৫ ভাগ রপ্তানি হয় G8 দেশগুলি থেকে, এবং তাঁরা এ নিয়ে একেবারেই আলোচনা করতে চান বলে মনে করার কারণ আমি দেখি না। কিন্তু তার ফলে প্রধানত আফ্রিকাতে এবং অন্যত্র আঞ্চলিক যুদ্ধের মালমশলা পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় দেশগুলি যোগাচ্ছেন। এরকম প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা জিনিস ভাবার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। আমার বই Identity and Violence-এ এ নিয়ে খানিকটা আলোচনা আছে। এইসব বিষয়ে করণীয় অনেক কিছুই আছে। ❐

আলাপচারিতা ঃ অরুণ দাস
এপ্রিল ২০০৬

প্রণব বর্ধনের চোখে......

১৬ পৃষ্ঠার পর

অনেকদিন ধরে অনুপ্রাণিত করছে। নোবেল প্রাইজ তো ১৯৯৮-তে পেলেন; আমি বলব, তার কুড়ি বছর আগে থেকেই রোল মডেল হয়ে গেছেন উনি ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের কাছে। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে এদেশে নামকরা ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের অর্ধেকের বেশী বাঙালি, তো লোকে বলে এটা কি করে সম্ভব? আমি বলব যে এতে কতগুলো প্রতিষ্ঠানের অবদান নিশ্চয়ই আছে, এই অর্থনীতিবিদদের বেশির ভাগই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছেন। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে নিজেই পড়ে জানি, এবং অমর্ত্যদাও বলবেন শিক্ষকদের একটা বড় অবদান আছে। ওঁরা এমনকি আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের সিলেবাসের বাইরে জার্নাল ইত্যাদি আমাদের পড়িয়েছেন; তাতে একটা নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রথম প্রথম অনেক কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু কিছু বুঝতে পারলে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, অন্য বিষয়েও তো অনেক ভাল ভাল শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু ইকনমিক্সেই এটা কেন হল? আমি বলব - আমার নিজস্ব মত - এটার কারণ অমর্ত্য সেনের রোল মডেল হওয়াটা। উনি এত আগে উঠে গেছেন উপরে, এই ব্যাপারটা আমাদের চেষ্টা করার উৎসাহ দিয়েছে। ❐

আলাপচারিতা ঃ অরুণ দাস
এপ্রিল ২০০৬